একটি কালিক উচ্চারণ

সুশান্ত বর্মন

বৈষম্যপুর্ণ সমাজের শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতীক নারী। এটা বলা যেমন অতিশয়োক্তি নয়, তেমন এভাবে বলাটাও আর ভুল নয়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক এদের মতো নারীরাও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। অন্য সব শ্রেণীর মতো এই শ্রেণীটিকেও শোষন করে চলেছে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো। জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করে যে নারী, সে নারী জীবন থেকে আজ বঞ্চিত; জীবনে উৎপীড়িত। উৎখাত করা হয়েছে তাকে বেঁচে থাকা থেকে, জীবন থেকে; আর এটা করেছে পুর"ষ। সমাজ কাঠামোর ছত্রছায়ায় রূপকথার ভণ্ডামো দিয়ে পুর"ষরা মেয়েদেরকে যে সোনার শেকলে বেঁধেছে, তার মায়া তারা আর কাটাতে পারছেনা। ইতিহাসের সব শোষিত, শাসিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত শ্রেণীর মতো এদেশের নারীরাও নিজেরাই নিজেদের শক্তি, সামর্থ, অধিকার, অবস্থান এবং শ্রেণী স্বাতন্ত্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা নিজেরাই চায় নিজেদেরকে রূপকথা ও বিউটির শেকলে বেঁধে রাখতে। কার্ল মার্ক্স বলেছেন 'শোষিত শ্রেণী নিজেরাই শোষন যন্ত্রটির চাকা ঘুরিয়ে থাকে।' বাংলাদেশের নারীদের সম্পর্কে এ কথাটা বড় বেশি বাস্ব।

নারী অধিকার বা নারীমুক্তি নামক কনসেপ্টটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দাবি করে। এতকাল যা চলেছে ও চলছে, তা মানবিক নয়, নারীর জন্য মানসম্মত নয়- এমন বক্তব্যই রাখে নারী অধিকার মনোভঙ্গী। এই আন্দোলনের কিছু রঙিন আবেদন আছে, যা প্রচারমাধ্যমগুলোর কল্যাণে সর্বারণ্যে প্রথমেই প্রকাশিত-প্রচারিত হয়। আর সাধারণ লোকেরা নারী সাম্যকে বুঝে নেয় সেভাবেই, এতে রসদ যোগায় শোষক ও মোল্লা শ্রেণী। কিন্তু নারী অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে যে হাজার বছরের দীর্ঘশ্বাস ও বঞ্চনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে তার তাৎপর্য অনেক বেশি গুর"ত্বপুর্ণ ও ব্যাপক। খৃস্টপুর্ব ২৩০০ অব্দে সুমেরীয় সম্রাট ঝবৎমড়হ ড়ভ অৎধমধফব এর কন্যা অহযবফঁধহধ একটি কবিতা লিখেছিলেন –

"We sing, mourn and cry before you
and walk towards you along a path
from the house of enormous sighs"

মাটির ফলকে তাঁর এই একটি মাত্র কবিতাই পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে যে বেদনা ও আহাজারি উ"চারিত হয়েছে তা কাল অতিক্রম করে আজও সত্য হয়ে রয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে রাজকন্যা হিসেবে নয় একজন নারী হিসেবে তাঁর বুকে যে দীর্ঘশ্বাস উ"চারিত হয়েছিল, তা আজও থেমে যায়নি। বরং তা হয়েছে আরও জমাট, পুঞ্জীভুত। নারীকণ্ঠ শুধু যে দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ করেছে– এমনও নয়। ক্ষোভ, ঘৃণা, ক্রোধ, ভালোবাসা, শরীর, মন, স্বপ্ন, আবেগ ইত্যাদি বিষয়ে নারীর উ"চারণ প্রাত্যাহিক ছিল। সবকিছুর পিছনে প্রেরণা হিসাবে স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মর্যাদা লাভের দর্শন কাজ করতো। এই মুক্ত মানবতাকে পুর"ষরা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তাই নারী অধিকার দর্শনটি যুগে-যুগে, কালে-কালে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, সংসারে, অফিসে, স্কুল-কলেজে, কর্মক্ষেত্রে, ঘরে, বিছানায় হয়েছে ভুলুণ্ঠিত, অপমানিত। নারী মর্যাদা হারিয়েছে সহকর্মীর, বন্ধুত্বের। পুর"ষ একে বিজয় ভেবে নিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছে । মনে করেছে এতেই নিরঙ্কুশ থেকেছে তার পৌর"ষত্ব।

অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষে 'কাক্ষীবতী', 'ঘোষা', 'মৈত্রেয়ী', 'অপালা', 'বাক্', 'গার্গী', 'সুলভা', 'ব্রহ্মবাদিনী' প্রমুখ নারী ঋষিরা নিজগুণে প্রখ্যাত ছিলেন। মহাগ্রন্থ বেদের একাধিক সুক্ত বা ঋক্ বা শ্লোকের রচয়িতা ছিলেন নারী। প্রসঙ্গত বেদান্তের যা মহৎ তত্ত্ব 'সোঅহম' অর্থাৎ 'আমিই সেই' বা 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই সেই' মন্ত্রটির রচয়িতা ছিলেন 'বাক্'। তিনি ছিলেন 'অম্ভ্রণ' ঋষির কন্যা। বেদে 'মুদ্গালিনী', 'বিশ্পলা', 'বধ্রিমতী' প্রমুখ নারী যোদ্ধাদের নাম পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে নারীর উপনয়নের কথা পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত থেকে জানি নারীর 'স্বয়ম্বর' অনুষ্ঠানের কথা। যে

অনুষ্ঠানে নারী নিজের পতি নিজেই একাধিক উপস্থিত পুর"ষের মধ্য থেকে বেছে নিত। কালিদাসের মেঘদুতে পাই নারীর বিভিন্ন সক্রিয় আচরণের কাহিনী। মহাভারত পড়ে জানি নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের কথা। যা ছিল আসলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি অনন্য নিদর্শণ। পরবর্তীকালে এই উদার ধারাবাহিকতা আর রক্ষা করা যায়নি। বিভিন্ন বিদেশী নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় তথা বাংলাদেশ অঞ্চলের এই উদারবাদী পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়, নারীরা ঘরের কোণে বন্দী হতে বাধ্য হয়। যে বন্দী দশা থেকে আজও তাঁদের মুক্তি ঘটেনি।

এদেশ খুব দ্র"ত প্রবেশ করছে দুই হাজার সালের উদার ও সহিষ্ণু মহাকালে। কিন্তু নারীরা থেকে যা"ছে পুর"ষের সমাজে। এখানে নারী সম্স্লর্কিত সমস্ সিদ্ধান্ নেয়ার অধিকার যেন পুর"ষের, তাই নারীরা এখনও মেকআপ বক্স মাত্র। তাদের সমস্ শিক্ষা ও মনোযোগ আবর্তিত হয় পুর"ষের আকর্ষণ ধরে রাখাকে কেন্দ্র করে। পুর"ষ পছন্দ করবে বলেই সে কসমেটিকস, পোষাক, ফ্যাশন, লেখাপড়া ইত্যাদিকে আশ্রয় করে। এখনো নারীরা চায় নিজেদের আরও বেশি আকর্ষণীয়, লোভনীয়, কমনীয়, রমনীয়, মোহনীয় করে তুলতে। পুর"ষতান্ত্রিক সমাজের অপর কৃতিত্ব ধর্ষণপ্রবণতায়। আর ধর্ষণপ্রবণ সমাজে পৌর"ষ বলতে বোঝানো হয় হিংস্রতা ও কঠোরতাকে (–হুমায়ুন আজাদ)। এই সমাজে তিনিই বীর পুর"ষ যিনি রক্তলোলুপতাকে, শক্তিমদমত্ততাকে, কৌশুলীহত্যাকারীকে, অন্য মানুষের (নারী বা পুর"ষ) শরীরে তরবারী, চাকু, দা, কুড়াল, লাঠি, পাথর দ্বারা আঘাতকারীকে, সফল এসিড নিক্ষেপককে সম্মানীয়, বরণীয়, শ্রদ্ধেয়, মহৎ বলে মনে করেন এবং নিজেও তেমন আচরণ করেন। এই সভ্যতা নারীকে উৎসাহ দেয় আরও বেশি মেয়েলীপনায়, কোমলতায় অভ্যস্, আক্রান্ হতে, নির্ভরশীল হতে।

দেশের-সমাজের ব্যাপক বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছুই নির্ধারিত হয় কোমলতার মানদণ্ডে। নারীরা সেলাই করবে, রান্না করবে, বা"চা সামলাবে, নার্স হবে, লেখক হবে, শিক্ষক হবে এবং হবে সিনেমার নায়িকা। ডাক্তারও হবে কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে, গাইনোকলজি ও সাইকোলজিতে। ইঞ্জিনিয়ারও হবে কিন্তু প্রধানত ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরে। প্রশাসন, পুলিশ ও সৈন্য বিভাগেও থাকবে কিছু, কিন্তু তা হবে পুর"ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাসন মেনে নিয়ে, অফিস বিল্ডিং কেন্দ্রিক, কম দায়িত্বপূর্ণ কাজে, কম সংখ্যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনকল্যাণ ও এ সম্স্লর্কিত কৃত্রিম আচরণই যেন তাদের মানায়– পুর"ষতান্ত্রিক সভ্যতা মেয়েদের কর্মক্ষেত্র সীমিত, বাঁধাধরা করে দেয় এভাবেই। আর মেয়েরাও ভাবে– এই তো বেশ! পুর"ষ বলে– "তোমরা সুন্দর; গোলাপের নরম পাঁপড়ির মত রেশমী কোমল হোক তোমার ত্বক ও শরীর। আরও সুন্দর হও, আমরা তোমাদের ভালোবাসবো। যত সুন্দর হবে আমরা তত বেশি আলিঙ্গন করবো। তোমরা ঘরে বসে চুল আঁচড়াবে, গালে রং মাখবে, চোখে কাজল দেবে আমরা তোমাদের রাজরাণী করে রাখবো, আদর করবো, ভালোবাসবো। যদি সতী স্ত্রী হও, তবে পরকালে আমার পদতলের অধিকার ও আমার অসংখ্য যৌনসঙ্গীদের রাণী হবার গৌরব পাবে (!?)।" এই সস্তা, চটকদার ও উদ্ভট বিজ্ঞাপনের ফাঁদে নারীরা পা দেয় সহজেই। এটাকেই তারা ভেবে নেয় নারীজীবনের চরমতম সার্থকতা বলে। বেঁচে থাকার জন্য শরীর বিনিময়ের এই আদিমতম নিয়মকে মেয়েরা মেনে নেয়, বিশ্বাস করে পবিত্রতম আচার বলে আর এই পবিত্রতম নিয়মকে মেনে নিয়ে মেয়েরা নিজেদেরকে পরিণত করে সুবিধাবাদী শ্রেণীতে। প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ নির্মোহ উ"চারণে চিহ্নিত করেছেন এই ধরণের সমাজের পুর"ষের দৃষ্টিতে নারীর স্বরূপ– "নারী, প্রিয়া হয়েও যেন প্রতিদ্বন্দ্বী, পরিজন হয়েও প্রতিযোগী, স্বজন হয়েও স্বতন্, সাথী হয়েও শাসিত, ঘরে-সংসারে সমাজে নারী-পুর"ষের সর্বত্র একটা দৃশ্য অদৃশ্য প্রতিপক্ষতা রয়েছে। জগতের সর্বত্র ও সব ভাষায় নারী সম্বন্ধে চালু রূপকথায়, উপকথায়, সাহিত্যে, প্রবাদে, প্রবচনে, কিংবদন্তীতে, বিশ্বাসে নারীর মন-মনীষা, বৃত্তি-প্রবৃত্তি, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা, অনাস্থা ও নিন্দাই প্রকাশ পেয়েছে। নারী কায়ায় খাটো, শক্তিতে হীন, চিত্তে চঞ্চল, আবেগে উদ্বেল, ইন্দ্রিয়ে তীক্ষ্ম, অনুভবে গভীর, ছলনায় পাকা, বাকে পটু, মণীষায় লঘু, বোধিতে তরল, সিদ্ধান্তে সরল। আবার হিংসায়, ঘৃণায় ঈর্ষায় অসুয়ায়-রিরংসায় ও প্রতিহিংসা প্রবণতায় নাগিনী, বাঘিনী ও হঠকারিনী। আবার আবেগ চালিত বলেই সহজেই মুগ্ধা জিগীষু নারী প্রেম প্রতারণার শিকার। রতিরমনে নারী নিষ্ক্রিয়, সম্ভোগে যেন

ভোগ্যামাত্র।" নারীর এই মর্মান্তিক সংজ্ঞা পুর"ষের মানবতাহীনতাকেই প্রমাণ করে। আহমদ শরীফ দেখেন সমসমাজের সমকালীন পুর"ষ মনে করে নারী যেন এক গৃহগত প্রয়োজনীয় সামগ্রী; সে সম্ভোগপাত্রী অর্থাৎ একটি পুর"ষভোগ্য প্রাণীমাত্র। নারীরাও এমন ধারণাকে বিশ্বাস ও লালন করে অবলীলায়। নিজের স্বাতন্ত্যচেতনাকে অনুভব ও উপলব্ধির বারান্দায় এনে দাঁড় করাতে পারে না। ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার আবছায়ায় নারী নিজেকে হারিয়ে ফেলে পুর"ষের বাহুতলে, পদতলে, বিছানায়। মেয়েরা কোমল কাজের উপযোগী এমন বিশ্বাস ধারণাকে অনেকাংশেই ভেঙে ফেলেছে দরিদ্র ক্ষুধার্ত গ্রামীণ নারীরা। কিন্তু তারাও ঘরে ফিরে বসে যায় রান্না করতে, বা"চার জন্য কাঁথা সেলাই করতে, স্বামীর পা ধোয়ার জন্য পানি এগিয়ে দিতে। শহুরে শিক্ষিত নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ যেন শুধু জনবল ও সৌন্দর্য বাড়ানোয়, সক্রিয় অংশ গ্রহণে নয়। ফলে এদেশের নারীরা এখনও রূপকথা আক্রান্ত হয়ে আছে। তাই এই সমাজে প্রাচীন নারীদের মতো আধুনিক নারীরাও অপেক্ষা করে থাকে একজন স্বপ্নিল রাজপুত্রের। নারী এখনও সেই পুর"ষকে কাম্য মনে করে যার বিদ্যা, বয়স, কৃতিত্ব, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এমনকি শারীরিক উ"চতা নারীর চাইতে বেশি। নারীর চাইতে কোন অংশে হীন বা খাটো পুর"ষ যেন সম্পূর্ণ মানুষ নয় এমন মনোভঙ্গী এযুগের নারীরা বিশ্বাস করে মনে প্রাণে।

যেমনটা হয়ে থাকে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে; যাদের যুক্তি দুর্বল, তাদের আশ্রয় হয় চিৎকার, শক্তি, অস্ত্র ও সন্ত্রাস। তেমন নারী যদি পুর"ষের কাছে মনুষ্যত্ব দাবী করে, তাহলে সে অভিধা পায় নির্লজ্জ, বেহায়া, দুশ্চরিত্র, কামুকী, অলক্ষ্মী, অসতী ইত্যাদির। পিঠে গ্রহণ করতে হয় হাজার দোররার দগদগে দাগ। নারীরাও এই নির্যাতন প্রবণতাকে বিশ্বাস ও সমর্থন করে মনে প্রাণে। ফলে প্রায় সব নারীই শারীরিকভাবে থেকে যায় বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত। হয়ে পরে মানসিকভাবে দুর্বল– পরিণতি মানসিক রোগী। এই হ"ছে আজকের বাংলাদেশের প্রচলিত বাস্তবতা। এখানে রোমান্টিকতাল জাল বুনে নারীকে রেখে দেয়া হয় অবদমিত, পরাধীন। আমাদের সাহিত্যের কোন কোন মহৎ পুর"ষ পুর"ষের এই নৃশংস স্বার্থপরতাকে সমর্থন করেছেন নির্দ্বিধায়, সন্তুষ্টচিত্তে।

নারীকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি নজর"ল ইসলাম অপার্থিব উ"চারণে বলেছেন–
"ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয় , এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।" (–পুজারিনী)

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারী বলতে বুঝতেন যাঁর হৃদয়ে স্নেহ আছে, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি যিনি প্রবলভাবে অনুগত। এই আরোপিত সংজ্ঞার বাইরের নারীকে তিনি নারী বলে স্বীকার করতে চাননি। সচেতন, দৃঢ়মনোভঙ্গীর, বিদ্রোহপ্রবণ, গর্বিত বা শিক্ষিত নারীরা তার চোখে নারীই নয়। পালি ভাষায় 'মাতুগাম' অর্থাৎ মায়ের জাত–এর বাইরের নারীদেরকে তিনি মনে করতেন 'রমণী' মাত্র। যেন রমণযোগ্যতা ছাড়া তাদের আর কোন যোগ্যতা নেই।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে নারীকে অধিকার রক্ষায় সচেতন হতে হবে নিজেকেই। রোমান্টিকতার চাঁদনী রাতে টলটলে পুকুরপাড়ে বসে থাকলে থেকে যেতে হবে অন্ধকারেই। চাঁদ উঠবে ঐ কল্পনাতেই, বাস্তবে নয়। তাই নারী নয়, পুর"ষ নয়, যারা নিজেকে মানুষ বলে দাবি করতে চায়, তাঁদের আজ উঠে দাঁড়াতে হবে, সকলের সামনেই। একটা ঝাঁকি দিয়ে সমাজকে তৈরী করতে হবে নতুন ভাবে, সাজাতে হবে নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে। এতে পরিবর্তন হবে গুর"তর, ভেঙেও যাবে অনেক বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার, প্রথা, সম্পর্ক। কিন্তু গঠিত হবে নতুন এক সর্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা, কাঠামো। যা মানবিক, মানুষের জন্য নিবেদিত, উপকারী। মনে রাখা দরকার পরিবর্তন মানেই অশুভ কিছু এমন ধারণা ভুল। কারণ

জীবাণুর রূপান্তর রোগ-বালাইয়ে, আর কলির পরিবর্তন বিকশিত ফুলে (–মাহবুব কামাল)। আমাদের এ উ"চারণ কালিক নিরীখে উত্তীর্ণ। ■